ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঘটনাবহুল জীবন

মন্ত্রীর বাড়ি ছেড়ে চলে যান এবং সঞ্জয়ের নামে একটা রাজনৈতিক দল গঠন করেন। সঞ্জয়ের রাজনৈতিক আসনে নিয়ে আসা হয় ইন্দিরার জ্যেষ্ঠ পুত্র এয়ারলাইন পাইলট রাজীব গান্ধীকে এবং পরবর্তীকালে তিনি হলেন ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক।

বেশ কয়েকটি রাজ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বিপর্যস্ত তাঁর দল ১৯৮৩-এর জানুয়ারীতে কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশের নির্বাচনে হেরে যায়। অথচ এ দুটো রাজ্য বরাবরই ইন্দিরা কংগ্রেসের দুর্গ বলে পরিচিত ছিল। ১৯৭৭-এর নির্বাচনে অধিকাংশ রাজ্যে ইন্দিরা কংগ্রেসের ভরাডুবি হলেও এ দুটি রাজ্য তার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮৩ সালে মারাত্মক দুটো সমস্যার সম্মুখীন হন—যা রূপান্তরিত হয় ভয়াবহ হিংসাত্মক ঘটনায়।

গত বছরের ফেব্রুয়ারীতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের আসামে নির্বাচন ঘোষণার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রায় ৩ হাজার লোক নিহত হয়। অবশ্য ইন্দিরা কংগ্রেস জয়লাভ করে নির্বাচনে।

কংগ্রেস শাসিত পাঞ্জাবে বিরোধী শিখ আকালী দল বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে এক দীর্ঘ স্থায়ী আন্দোলনে নামে। চরমপন্থীরাও এতে যোগ দেন এবং গোলযোগ ও হানাহানি পাঞ্জাবে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

পরিশেষে ১৯৮৪-এর জুন মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনী শিখদের পবিত্রতম মন্দির অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে হামলা চালায়। শত শত শিখ নিহত হয় এবং এর পরিণতিতে দলমত নির্বিশেষে সকল শিখ ইন্দিরা বিরোধী চেতনায় একাট্টা হয়ে ওঠে। এর চূড়ান্ত পরিণতি কি দাঁড়াবে তা ছিল ধারণাতীত। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যা অসাধ্য তাকে সামলে নিতেই অভ্যস্ত ছিলেন ইন্দিরা।

১৯৬৬ সালের জানুয়ারীতে ৪৮ বছর বয়সে তিনি যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন তার সামনে ছিল সরকার পরিচালনার সবচেয়ে দুরূহ কিছু সমস্যা।

বন্যা ও খরা ভারতের নিত্যসঙ্গী। যেকোন কারণে ফসলহানি হলে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটার আশংকা সর্বদাই বর্তমান। দেশের ৭০ কোটি জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ বাস করে দারিদ্র্য সীমার নীচে।

ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত ১৯৭৪ সালে বিশ্বের ষষ্ঠ পরমাণু শক্তিধর দেশে পরিণত হয়। ১৯৮০ সালে রকেট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে মহাকাশ শিবিরে যোগ দেয় ভারত।

বৈদেশিক ক্ষেত্রে ভারত বড় বেশী সোভিয়েটের দিকে ঝুঁকে পড়ছে এই অভিযোগ ইন্দিরা গান্ধী একাধিকবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। নয়াদিল্লীর জোটনিরপেক্ষ ভূমিকাকে সপ্রমাণিত করার জন্য ১৯৮২ সালে তিনি মস্কো ও ওয়াশিংটন উভয়স্থানই সফর করেন।

১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সময় ইন্দিরা জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে ভারতের সমস্যাবলী প্রকট হয়ে ওঠায় জনমত তার বিরুদ্ধে চলে যায়। ইন্দিরার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে উত্তরোত্তর স্বৈরাচারী ভূমিকার।

নির্বাচনে কারচুপির বিরুদ্ধে আদালতে আনীত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে যখন তার বিরুদ্ধে জনমতের উত্তাল জোয়ার বইছিল তখন ক্ষমতা থেকে সরে না গিয়ে তিনি ১৯৭৫-এর ২৬শে জুন ঘোষণা করলেন অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা। এসময় শত শত রাজনৈতিক বিরোধীকে জেলে পোড়া হয়। গণতন্ত্র স্থগিত রাখা হয়, সংবাদপত্রের উপর জারি করা হয় সেন্সরশীপ।

বাবা জওহরলাল নেহরু, মা কমলা নেহরুর সঙ্গে কিশোরী ইন্দিরা

সঞ্জয়ের নেতৃত্বাধীন অফিসার ও কঠোরপন্থী পর্যবেক্ষকদের একটি কোটারী পরিবেষ্টিত ইন্দির ক্রমশ একঘরে হয়ে পড়েন এবং জাতীয় ভাবমানসের সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়।

ব্যাপক বন্ধ্যাকরণ অভিযান—যার প্রবক্তা ছিলেন সঞ্জয় নিজে সেটাই ছিল ইন্দিরার জরুরী অবস্থার সম্ভবত সবচেয়ে গর্হিকৃত দিক। তবে নাগরিক অধিকার হরণের ফলে দেশের সর্বত্র বিশেষত উত্তরাঞ্চলে গণঅসন্তোষও ধূমায়িত হচ্ছিল।

১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে ইন্দিরা সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ করে জরুরী অবস্থার অবসান ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। ইন্দিরা বিরোধী চেতনার জোয়ার তাকে ক্ষমতা

থেকে হটিয়ে দেয়। অধিষ্ঠিত হয় জনতা পার্টির কোয়ালিশন। এই ভরাডুবির মধ্য দিয়ে কংগ্রেস পার্টি স্বাধীনতার ত্রিশ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত পরাজিত শুধু হল না, ইন্দিরা নিজের আসনটিও হারালেন।

এই বিপর্যয়ের পর অনেক ভাষ্যকারের দৃষ্টিতে ইন্দিরা গান্ধী ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দিরা সতর্কতার সাথে তার প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ক্ষমতাসীন দলের কৌশলগত ভুলত্রুটি এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দলের পূর্ণ সুযোগ অত্যন্ত চাতুর্য ও দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগান তিনি।

দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে তিনি প্রথম গ্রেফতার হন। অবশ্য এই অভিযোগ পরে প্রত্যাহার করা হয়।

ইন্দিরার এসময়কার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চাল ছিল কংগ্রেসে তার নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দলছুট অংশটি দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসভা নির্বাচনে নিরংকুশ বিজয় অর্জন করে।

এরপর পাঁচ-দলীয় জনতা কোয়ালিশনের ভেতরকার তীব্র কোন্দলের পরিনামে ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের পতন ঘটে।

দেশাইয়ের ডেপুটি চরণ সিং এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। মিসেস গান্ধী চরণ সিংকে সমর্থন দেন। কিন্তু শিগগিরই তিনি সমর্থন প্রত্যাহার করেন ও মধ্যবর্তী নির্বাচন দিতে বাধ্য করেন—অর্থাৎ ক্ষমতায় ফিরে আসার পথ তৈরি করেন। নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি এমন একটি সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন যা দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।

ইন্দিরা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৭ সালের ১৯শে নবেম্বর। শৈশব কাটে এলাহাবাদে অবস্থিত নেহেরুর পৈতৃক বাড়িতে। বাড়িটি বৃটিশ বিরোধী একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

একবার তিনি বলেছিলেন শৈশবে আমার সব খেলাই ছিল রাজনৈতিক খেলা। আমি ছিলাম জোয়ান অব আর্ক—দিন কাটতো সব সময়ই বিপদের মধ্যে।

তিনি স্থানীয় একটি কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়ার দায়ে তাঁর পিতামাতা ফুফু ও সম্পর্কীয় ভাই ও বোনদের জেলে যাওয়া উপলক্ষে তাদের কাপড়চোপড় গুছিয়ে দিতে গিয়ে ইন্দিরার স্কুলের পড়ালেখায় দারুণ বিঘ্ন ঘটতে থাকে।

ইংরেজী ভাষায় তাঁর চমৎকার দখল ও ফরাসী বলার দক্ষতা তিনি অর্জন করেছিলেন ইংল্যান্ডের ও সুইজারল্যান্ডের স্কুলে এবং অক্সফোর্ডের সামারভিল কলেজে। এই কলেজে তিনি ইতিহাস পড়তেন, কিন্তু খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য কোর্স শেষ করতে পারেননি।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্দিরার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ছিল তার বাবার নেহরু খুবই যত্নের সঙ্গে তাঁকে বড় করে তোলেন যাতে একদিন তাঁর উত্তরসূরী হতে পারে।

ইন্দিরা ১৯৪২ সালে তার সহপাঠী পার্সী তরুণ ফিরোজ গান্ধীকে বিয়ে করেন। পিতামাতার ঐতিহ্য অনুসরণ করলে অবশ্য তাকে বিয়ে করতে হতো কোন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণকে। ফিরোজ অবশ্য গান্ধীজী আত্মীয় ছিলেন না। বিয়ের এক মাসের মধ্যেই বৃটিশ বিরোধী ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দেয়ার দায়ে স্বামী-স্ত্রীকে জেলে যেতে হয়। ফিরোজ ১৯৬০ সালে মারা যান।

পিতার সঙ্গী হিসেবে পঞ্চাশের দশকে ইন্দিরা রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। নেহরু দীর্ঘকাল বিপত্নীক জীবন কাটান।

ইন্দিরা গান্ধী ১৯৫৫ সালে কংগ্রেসের নির্বাহী কমিটিতে যোগ দেন। চার বছর পর দলের প্রেসিডেন্ট হন।

নেহরু ১৯৬৪ সালে মারা যান। এরপর লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে তিনি তথ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম মন্ত্রিসভায় যোগ দেন।

দু বছর পর শাস্ত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের তাসখন্দে মারা যান। এর পর কংগ্রেস তাকে ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে।

ধর্মে হিন্দু হলেও ইন্দিরা ছিলেন মনেপ্রাণে ধর্ম নিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী ভারতের পক্ষে।

ইন্দিরা দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন খর্ব করেছিলেন সাবেক করদ রাজাদের সুযোগ-সুবিধা। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস প্রথম যখন দ্বিধাবিভক্ত হয় সেসময় দলের বাম অংশের সাথে নিজেকে একাত্ম করেছিলেন।

অভিজাত নেহরু পরিবারে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের সংমিশ্রণে।

ইন্দিরা একবার বলেছিলেন : মা আমাকে শিখিয়েছেন মাটির উপর শক্ত করে দাঁড়াতে। আর বাবা সবসময় বলতেন, আমাকে শিখরে পৌঁছতে হবে।